সমবায়নীতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমবায়নীতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

প্রকাশ ১৩৬০

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। শততম সংখ্যা

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা
৩·১

সূচীপত্র

মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের
মধ্যেই; এই খানেই প্রাণের নিকেতন;
লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন
সন্ধান করেন।

সেই আসন অনেকখানি প্রস্তুত
হয় নাই। ধনপতি কুবের দেশের
লোকের মনকে টানিয়াছে শহরের
যক্ষপুরীতে। শ্রীকে তাঁহার অন্নক্ষেত্রে
আবাহন করিতে আমরা এইকালে ভুলিয়াছি,
সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য
গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দ গেল, প্রাণশক্তি
অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। আজ
পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত,
পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন

শিথিলে, অর্থ হলেই ক্রমশঃ লোকালয়ের জীবনকে প্রতিমুহূর্তে জীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে। সময় আর অধিক নাই। শ্রীহীন অনাদৃত দেশে যমরাজের শাসন দিকে দিকে রুদ্রমূর্তিতে প্রবল হইয়া উঠিল।

এখন যাঁহারা জীবধাত্রী পল্লিভূমির বিশুষ্ক স্তনে স্তন্য সঞ্চার করিবার ব্রত লইয়াছেন, তাঁহারা নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে আলো আনিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিতেছেন, মঙ্গলদাতা বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন; জ্ঞানের দ্বারা, অন্নদ্বারা, সেবাদ্বারা, পরস্পর মৈত্রীবন্ধন দ্বারা, বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র সমবায়ের দ্বারা

ভারতবাসীর বহুদিন সঞ্চিত মূঢ়তা
ও ঔদাসীন্য জনিত অপরাধরাশির
সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র দেবতার অভিশাপকে
সেই সর্বনেশে দেশ হইতে তিরস্কৃত
করুন এই আমি একান্তমনে কামনা
করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব? এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব। তাই, যখন আমরা পেটের জ্বালায় মরি তখন কপালের দোষ দিই; বিধাতা কিম্বা মানুষ যদি বাহির হইতে দয়া করেন তবেই আমরা রক্ষা পাইব, এই বলিয়া ধুলার উপর আধ-মরা হইয়া পড়িয়া থাকি। আমাদের নিজের হাতে যে কোনো উপায় আছে, এ কথা ভাবিতেও পারি না।

এইজন্যই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে— শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কখনোই ভাগ্যের দোষ নয়, অনেক স্থলেই এটা নিজের অপরাধ। দুর্দশার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই, এমন কথা মনে করাই মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের ধর্ম জয় করিবার ধর্ম, হার মানিবার ধর্ম নয়। মানুষ যেখানে আপনার সেই ধর্ম ভুলিয়াছে সেইখানেই সে আপনার দুর্দশাকে চিরদিনের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ দুঃখ পায় দুঃখকে মানিয়া লইবার জন্য নয়, কিন্তু নূতন শক্তিতে নূতন নূতন রাস্তা বাহির করিবার জন্য। এমনি করিয়াই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে। যদি কোনো দেশে এমন দেখা যায় যে সেখানে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ অচল হইয়া

পড়িয়া দৈবের পথ তাকাইয়া আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মানুষ সে দেশে মানুষের হিসাবে খাটো হইয়া গেছে।

মানুষ খাটো হয় কোথায়? যেখানে সে দশ জনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পূরা, একলা-মানুষ টুকরা মাত্র। এটা তো দেখা গেছে, ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভূতের ভয় হইত। বস্তুত এই ভূতের ভয়টা একলা-মানুষের নিজের দুর্বলতাকেই ভয়। আমাদের বারো আনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। সেটার গোড়াকার কথাই এই যে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া আছি। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি। বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা-কিছু দামী এবং বড়ো, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে। বালি-জমিতে ফসল হয় না, কেননা, তাহা আঁট বাঁধে না; তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতা-পচা প্রভৃতি এমন-কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আটা হয়। মানুষেরও ঠিক তাই; তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।

মানুষ যে পরস্পর মিলিয়া তবে সত্য মানুষ হইয়াছে তার গোড়াকার একটা কথা বিচার করিয়া দেখা যাক। মানুষ কথা বলে, মানুষের ভাষা আছে। জন্তুর ভাষা নাই। মানুষের এই ভাষার ফলটা কী? যে মনটা আমার নিজের মধ্যে বাঁধা সেই মনটাকে অন্যের মনের সঙ্গে ভাষার যোগে মিলাইয়া দিতে পারি। কথা কওয়ার জোরে আমার মন শ জনের হয়, দশ জনের মন আমার হয়। ইহাতেই ম.নুষ অনেকে

মিলিয়া ভাবিতে পারে। তার ভাবনা বড়ো হইয়া উঠে। এই বড়ো ভাবনার ঐশ্বর্যেই মানুষের মনের গরিবিয়ানা ঘুচিয়াছে।

তার পরে মানুষ যখন এই ভাষাকে অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে শিখিল তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের যোগ আরো অনেক বড়ো হইয়া উঠিল। কেননা, মুখের কথা বেশি দূর পৌছায় না। মুখের কথা ক্রমে মানুষ ভুলিয়া যায়; মুখে মুখে এক কথা আর হইয়া উঠে। কিন্তু লেখার কথা সাগর পর্বত পার হইয়া যায়, অথচ তার বদল হয় না। এমনি করিয়া যত বেশি মানুষের মনের যোগ হয় তার ভাবনাও তত বড়ো হইয়া উঠে; তখন প্রত্যেক মানুষ হাজার হাজার মানুষের ভাবনার সামগ্রী লাভ করে। ইহাতেই তার মন ধনী হয়।

শুধু তাই নয়, অক্ষরে লেখা ভাষায় মানুষের মনের যোগ সজীব মানুষকেও ছাড়াইয়া যায়, যে মানুষ হাজার বছর আগে জন্মিয়াছিল তার মনের সঙ্গে আর আজকের দিনের আমার মনের আড়াল ঘুচিয়া যায়। এত বড়ো মনের যোগে তবে মানুষ যাকে বলে সভ্যতা তাই ঘটিয়াছে। সভ্যতা কী? আর কিছু নয়, যে অবস্থায় মানুষের এমন-একটি যোগের ক্ষেত্র তৈরি হয় যেখানে প্রতি মানুষের শক্তি সকল মানুষকে শক্তি দেয় এবং সকল মানুষের শক্তি প্রতি মানুষকে শক্তিমান করিয়া তোলে।

আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা বহিতেছি। ভারে যখন ভাঙিয়া পড়ি তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জো থাকে না। য়ুরোপে যখন প্রথম আগুনের কল বাহির হইল তখন অনেক লোক, যারা হাত চালাইয়া কাজ করিত, তারা বেকার হইয়া পড়িল। কলের সঙ্গে শুধু-হাতে মানুষ লড়িবে কী করিয়া? কিন্তু য়ুরোপে মানুষ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না। সেখানে একের জন্য অন্যে ভাবিতে শিখিয়াছে; সে

দেশে কোথাও ভাবনার কোনো কারণ ঘটিলেই সেই ভাবনার দায় অনেকে মিলিয়া মাথা পাতিয়া লয়। তাই বেকার কারিগরদের জন্য সেখানে মানুষ ভাবিতে বসিয়া গেল। বড়ো বড়ো মূলধন নহিলে তো কল চলে না; তবে যার মূলধন নাই সে কি কেবল কারখানায় সস্তা মাহিনায় মজুরি করিয়াই মরিবে এবং মজুরি না জুটিলে নিরুপায়ে না খাইয়া শুকাইতে থাকিবে? যেখানে সভ্যতার জোর আছে, প্রাণ আছে, সেখানে দেশের কোনো-এক দল লোক উপবাসে মরিবে বা দুর্গতিতে তলাইয়া যাইবে ইহা মানুষ সহ্য করিতে পারে না; কেননা, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগে সকলের ভালো হওয়া, ইহাই সভ্যতার প্রাণ। এইজন্য য়ুরোপে যাঁরা কেবল গরিবদের জন্য ভাবিতে লাগিলেন তাঁরা এই বুঝিলেন যে, যারা একলার দায় একলাই বহিয়া বেড়ায় তাদের লক্ষ্মীশ্রী কোনো উপায়েই হইতে পারে না, অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকের ভাবনার যোগ ঘটিয়া সভ্য মানুষের ভাবনা বড়ো হইয়াছে। তেমনি অনেকের কাজের যোগ ঘটিলে কাজ আপনিই বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। গরিবের সংগতিলাভের উপায় এই-যে মিলনের রাস্তা য়ুরোপে ইহা ক্রমেই চওড়া হইতেছে। আমার বিশ্বাস, এই রাস্তাই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো উপার্জনের রাস্তা হইবে।

আমাকে এক পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে যাইতে হয়। সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, পাঁচ-ছয় মাইল ধরিয়া খেতের পরে খেত চলিয়া গেছে। ঢের লোকে এইসব জমি চাষ করে। কারো-বা দুই বিঘা জমি, কারো-বা চার, কারো-বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকাবাঁকা। এই জমির যখন চাষ চলিতে থাকে তখন প্রথমেই এই কথা মনে হয়, হালের গোরু

কোথাও-বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও-বা যথেষ্টর চেয়ে বেশি, কোথাও-বা তার চেয়ে কম। চাষার অবস্থার গতিকে কোথাও-বা চাষ যথাসময়ে আরম্ভ হয়, কোথাও সময় বহিয়া যায়। তার পরে আঁকাবাঁকা সীমানায় হাল বারবার ঘুরাইয়া লইতে গোরুর অনেক পরিশ্রম মিছা নষ্ট হয়। যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে ঘরে গোলায় তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরি আছে; প্রত্যেক গৃহস্থের স্বতন্ত্র গোলাঘর রাখিতে হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। যার বড়ো মূলধন আছে তার এই সুবিধা থাকাতেই সে বেশি মুনফা করিতে পারে, খুচরো খুচরো কাজের যে-সমস্ত অপব্যয় এবং অসুবিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।

যত অল্প সময়ে যে যত বেশি কাজ করিতে পারে তারই জিত। এইজন্যই মানুষ হাতিয়ার দিয়া কাজ করে। হাতিয়ার মানুষের একটা হাতকে পাঁচ-দশটা হাতের সমান করিয়া তোলে। যে অসভ্য শুধু হাত দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া চাষ করে তাহাকে হলধারীর কাছে হার মানিতেই হইবে। চাষবাস, কাপড়-বোনা, বোঝা-বহা, চলাফেরা, তেল বাহির করা, চিনি তৈরি করা প্রভৃতি সকল কাজেই মানুষ গায়ের জোরে জেতে নাই, কল-কৌশলেই জিতিয়াছে। লাঙল, তাঁত, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘানি প্রভৃতি সমস্তই মানুষের সময়ের পরিমাণ কমাইয়া কাজের

পরিমাণ বাড়াইয়াছে। ইহাতেই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে, নহিলে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বেশি তফাত থাকিত না।

এইরূপে হাতের সঙ্গে হাতিয়ারে মিলিয়া আমাদের কাজ চলিতেছিল। এমন সময় বাষ্প ও বিদ্যুতের যোগে এখনকার কালের কল-কারখানার সৃষ্টি হইল। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, যেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে শুধু-হাতকে হার মানিতে হইয়াছে তেমনি কলের কাছে আজ শুধু-হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল। ইহা লইয়া যতই কান্নাকাটি করি, কপাল চাপড়াইয়া মরি, ইহার আর উপায় নাই।

এ কথা আজ আমাদের চাষীদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না। কিন্তু এসব কথা পরের কারখানাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাবা যায় না। নিজে হাতে কলমে ব্যবহার করিলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়। য়ুরোপ-আমেরিকার সকল চাষীই এই পথেই হুহু করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। ইহার সুবিধা কী তাহা সামান্য একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়। ভালো করিয়া চাষ দিবার জন্য অনেক সময় বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন বৃষ্টি আসিল, সেদিন অনেক কষ্টে হাল-লাঙলে অল্প জমিতে অল্প একটু আঁচড় দেওয়া হইল। ইহার পরে দীর্ঘকাল যদি ভালো বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে সে বৎসর নাবী বুনানি হইয়া বর্ষার জলে হয়তো কাঁচা ফসল তলাইয়া যায়। তার পরে ফসল কাটিবার সময় তি ঘটে। কাটিবার লোক কম, বাহির হইতে মজুরের আমদানি হয়। কাটিতে কাটিতে বৃষ্টি আসিলে কাটা ফসল মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইতে থাকে। কলের লাঙল, কলের ফসল-কাটা যন্ত্র থাকিলে সুযোগমাত্রকে অবিলম্বে ও পুরাপুরি আদায় করিয়া লওয়া যায়। দেখিতে

দেখিতে চাষ সারা ও ফসল কাটা হইতে থাকে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বাঁচে।

কিন্তু কল চালাইতে হইলে জমি বেশি এবং অর্থ বেশি চাই। অতএব গোড়াতেই যদি এই কথা বলিয়া আশা ছাড়িয়া বসিয়া থাকি যে, আমাদের গরিব চাষীদের পক্ষে ইহা অসম্ভব, তাহা হইলে এই কথাই বলিতে হইবে, আজ এই কলের যুগে আমাদের চাষী ও অন্যান্য কারিগরকে পিছন হঠিতে হঠিতে মস্ত একটা মরণের গর্তে গিয়া পড়িতে হইবে।

যাহাদের মনে ভরসা নাই তাহারা এমন কথাই বলে এবং এমনি করিয়াই মরে। তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া, সেবাশুশ্রূষা করিয়া, কেহ বাঁচাইতে পারে না। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক্ পৃথক্ চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না। কোনো চাষীর গোয়ালে যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের মাত্র দুধ বাড়তি থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যাবসা করিতে পারে না। কিন্তু এক-শো দেড়-শো চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন-তোলা কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যাবসা চালাইতে পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যাবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে। ডেন্মার্ক্ প্রভৃতি ছোটো-ছোটো দেশে সাধারণ লোকে এইরূপে জোট বাঁধিয়া মাখন পনির ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসায় খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। এই-সকল ব্যবসায়ের যোগে সেখানকার সামান্য চাষী ও সামান্য গোয়ালা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আপন বৃহৎ

সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছে। এমনি করিয়া শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় সে বড়ো হইয়াছে। এমনি করিয়া অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই য়ুরোপে আজকাল কোঅপারেটিভ-প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কোঅপারেটিভ-প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যাবসা-বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়; ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক-এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোটো শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরী কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ্ হইয়া, সহায় হইয়া, মিলিতে পারিবে।

আজ আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকে দেশের কাজ করিবার জন্য আগ্রহ বোধ করেন। কোন্ কাজটা বিশেষ দরকারী এ প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। অনেকে সেবা করিয়া, উপবাসীকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দেশের কাজ করিতে চান। গ্রাম জুড়িয়া যখন আগুন লাগিয়াছে তখন ফুঁ দিয়া আগুন নেবানোর চেষ্টা যেমন ইহাও তেমনি। আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলিকে ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই

তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া— বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের মনটা গ্রাম্য এবং একঘরে হইয়া আছে, তাহাদিগকে সর্বমানবের জাতে তুলিয়া গৌরব দিতে হইবে, ভাবের দিকে তাহাদিগকে বড়ো মানুষ করিতে হইবে— আর-এক, জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া। বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাংসারিক দিকে তাহারা দুর্বল ও একঘরে হইয়া আছে। এখানেও তাহাদিগকে মানুষের বড়ো সংসারের মহাপ্রাঙ্গণে ডাক দিয়া আনিতে হইবে, অর্থের দিকে তাহাদিগকে বড়োমানুষ করিতে হইবে। অর্থাৎ শিকড়ের দ্বারা যাহাতে মাটির দিকে তাহারা প্রশস্ত অধিকার পায় এবং ডালপালার দ্বারা বাতাস ও আলোকের দিকে তাহারা পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহাই করা চাই। তাহার পরে ফলফুল আপনিই ফলিতে থাকিবে, কাহাকেও সেজন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে না।

শ্রাবণ ১৩২৫

সমবায় ২

মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা-মানুষ কখনোই পূর্ণমানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোলো আনা পেয়ে থাকে।

দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। লোভ ক্রোধ মোহ প্রভৃতিকে মানুষ রিপু অর্থাৎ শত্রু বলে কেন? কেননা, এইসমস্ত প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের মনকে দখল ক'রে নিয়ে মানুষের জোট বাঁধার সত্যকে আঘাত করে। যার লোভ প্রবল সে আপনার নিজের লাভকেই বড়ো করে দেখে, এই অংশে সে অন্য সকলকে খাটো করে দেখে; তখন অন্যের ক্ষতি করা, অন্যকে দুঃখ দেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়। এইরকম যেসকল প্রবৃত্তির মোহে আমরা অন্যের কথা ভুলে যাই, তারা যে কেবল অন্যের পক্ষেই শত্রু তা নয়, তারা আমাদের নিজেরই রিপু; কেননা, সকলের যোগে মানুষ নিজের যে পূর্ণতা পায়, এই প্রবৃত্তি তারই বিঘ্ন করে।

স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই-যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহুমানুষের শক্তির ফল লাভ করে। চার পয়সা খরচ করে কোনো মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেকে কন্যাকুমারীতে কখনোই পাঠাতে পারত না; পোস্ট্-অফিস জিনিসটি বহু মানুষের সংযোগ-সাধনের ফল; সেই ফল এতই বড়ো যে তাতে চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে দরিদ্রকেও লক্ষপতির দুর্লভ সুবিধা দিয়েছে। এই একমাত্র পোস্ট্-অফিসের যোগে ধর্মে অর্থে শিক্ষায়

পৃথিবীর সকল মানুষের কী প্রভূত উপকার করছে হিসাব করে তার সীমা পাওয়া যায় না। ধর্মসাধনা জ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার কত-যে অনুষ্ঠান চলছে তা বিশেষ করে বলবার কোনো দরকার নেই ; সকলেরই তা জানা আছে।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে, যেসকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের সুযোগ আছে সেইখানেই সকলের এবং প্রত্যেকের কল্যাণ। যেখানেই অজ্ঞান বা অন্যায় -বশত সেই সুযোগে কোনো বাধা ঘটে সেইখানেই যত অমঙ্গল।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা জায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে অর্থোপার্জনের কাজে। এইখানে মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড়ো হব, এই কথা যেখানেই মানুষ বলেছে সেইখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে ; কেননা, পূর্বেই বলেছি কোনো মানুষই একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ নিয়ে, প্রতাপ নিয়ে, মানুষে মানুষে যত লড়াই, যত প্রবঞ্চনা।

অর্থ-উপার্জন শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত তা হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত। ধনীর উপরে বরাবর এই একটি ধর্ম-উপদেশ চলে আসছে যে, তুমি দান করবে। তার মানেই হচ্ছে ধর্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় ধনেও কল্যাণের দাবি খাটে, না খাটাই অধর্ম। কল্যাণের দাবি হচ্ছে স্বার্থের দাবির বিপরীত এবং স্বার্থের দাবির চেয়ে তা উপরের জিনিস। দানের যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু কল্যাণকে স্বার্থের অনুবর্তী করা

হয়েছে, তাকে পুরোবর্তী করা হয় নি। সেইজন্য দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর না হয়ে বরঞ্চ তা পাকা হয়ে ওঠে।

ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই, সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে ব'লেই, যাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান তাঁদের অনেকেই জবর্দস্তির দ্বারা লক্ষ্যসাধন করতে চান। তাঁরা দস্যুবৃত্তি ক'রে, রক্তপাত ক'রে, ধনীর ধন অপহরণ ক'রে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এসমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেইজন্যেই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি ; কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অতএব ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই এই দুয়ের কোনোটাই মানবসমাজের দারিদ্র্য-মোচনের পন্থা নয়। মানুষকে দেখানো চাই যে, বড়ো মূলধনের সাহায্যে অর্থসম্ভোগকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আটকে রাখা সম্ভব হবে না। আজকের দিনে যদি কোনো ক্রোরপতি উটের ডাক বসিয়ে কেবলমাত্র তাঁর নিজের চিঠি-চালাচালির বন্দোবস্ত করতে চান তা হলে সামান্য চাষার চেয়েও তাঁকে ঠকতে হবে ; অথচ পূর্বকালে এমন এক দিন ছিল যখন ধনীরই ছিল উটের ডাক, আর চাষীর কোনো ডাক ছিল না। সেদিন ধনীকে তাঁর গুরুঠাকুর এসে যদি ধর্ম-উপদেশ দিতেন তবে হয়তো তিনি তাঁর নিজের চিঠিপত্রের সঙ্গে গ্রামের আরও কয়েক জনের চিঠিপত্রের ভারবহন করতে পারতেন, কিন্তু তাতে করে দেশে পত্রচালনার অভাব প্রকৃতভাবে দূর হতে পারত না। সাধারণের দারিদ্র্য-হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।

সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধনবণ্টন করে কোনো লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তিবিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখাতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না। মানুষের মনে ধনভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাট্‌ভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

মানুষের ইতিহাসে এক দিকে রাজশক্তি অন্য দিকে প্রজাশক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব আছে। রাজার প্রতি ধর্ম-উপদেশ ছিল যে, প্রজার মঙ্গলসাধনই তাঁর কর্তব্য। সে কথা কেউ-বা শুনতেন, কেউ-বা আধা-আধি শুনতেন, কেউ-বা একেবারেই শুনতেন না। এমন অবস্থা এখনো পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে। অধিকাংশ স্থলেই এই অবস্থায় রাজা নিজের সুখসম্ভোগ, নিজের প্রতাপবৃদ্ধিকেই মুখ্য ক'রে প্রজার মঙ্গলসাধনকে গৌণ করে থাকেন। এই রাজতন্ত্র উঠে গিয়ে আজ অনেক দেশে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এই ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্মশাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসনশক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকল-রকম প্রতাপের

প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্‌'এ রাষ্ট্রচালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।

এইজন্যে, যথেষ্টপরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ্‌ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তা হলে ধন টাকা-আকারে কোনো এক জনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না; কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায় সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পাবে। সমবায়-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।

এই সমবায়-প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা ও পরীক্ষা আমাদের দেশে সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দারিদ্র্য থেকে রক্ষা না পেলে আমরা সকল-রকম যমদূতের হাতে মার খেতে থাকব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক-একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার, সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাব-মোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের

পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক্‌-স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি ক'রে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কিভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা।...

ফাল্গুন ১৩২৯

ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা

বহুদিন পূর্বে, এখানে আজ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা যখন অনেকেই বালক ছিলেন বা জন্মান নি, তখন একদা ভেবেছিলাম যে, পূর্বকালে আমাদের সমাজদেহে প্রাণক্রিয়ার একটা বিশেষ প্রণালী সুস্থ ও অব্যাহত ভাবে কাজ করছিল। পাশ্চাত্য মহাদেশে এক-একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে প্রাণশক্তিকে সংহত ক'রে জনচিত্ত আর্থিক ও পারমার্থিক ও বুদ্ধিগত ঐশ্বর্য সৃষ্টি করছে। সেইসকল কেন্দ্র থেকেই তাদের শক্তির যথার্থ উৎস। ভারতবর্ষে সর্বজনচিত্ত ধর্মে কর্মে ভোগে গ্রামে গ্রামে সর্বত্র প্রবাহিত হয়েছিল। সেইজন্যেই নানা কালে বিদেশী নানা রাজশক্তির আঘাত অভিঘাত তার পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে নি। এমন গ্রাম ছিল না যেখানে সর্বজনসুলভ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা ছিল না। গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল এইসকল পাঠশালার অধিষ্ঠানস্থল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন যাঁর ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। সমাজধর্মের আবহমান আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার ভার তাঁদের উপরেই ছিল। তখনকার কালে ঐশ্বর্যের ভোগ একান্ত সংকীর্ণভাবে ব্যক্তিগত ছিল না। এক-একটি মূল ঐশ্বর্যের ধারা থেকে সর্বসাধারণের নানা ব্যবহারের বহুশাখাবিভক্ত ইরিগেশন-ক্যানালগুলি নানা দিকে প্রসারিত হ'ত। তেমনি জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার সকলের কাছে অবারিত ছিল। গুরু শুধু বিদ্যাদানই করতেন না, ছাত্রদের কাছ হতে খাওয়া-পরার মূল্য পর্যন্ত নিতেন না। এমনি ভাবে সর্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তি গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই তখন জলের অভাব হয় নি, অন্নের অভাব হয় নি, মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয় নি।

সেইটাতে আঘাত করলে যখন ইউরোপীয় আদর্শে নগরগুলিই দেশের মর্মস্থান হয়ে উঠতে লাগল। আগে গ্রামে গ্রামে একটি সর্বস্বীকৃত সহজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই যে একটা সামাজিক যোগ ছিল বাইরের আঘাতে এই সামাজিক স্নায়ুজাল খণ্ড খণ্ড হওয়াতে গ্রামে গ্রামে আমাদের প্রাণদৈন্য ঘটল। একদিন যখন বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে আমার নিত্যসংস্রব ছিল তখন এই চিন্তাটিই আমার মনকে আন্দোলিত করেছে। সেদিন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখেছি যে, যে ব্যাপক ব্যবস্থায় আমাদের দেশের জনসাধারণকে সকল রকমে মানুষ ক'রে রেখেছিল আজ তাতে ব্যাঘাত হচ্ছে, দেশের সর্বত্র প্রাণের রস সহজে সঞ্চারিত হবার পথগুলি আজ অবরুদ্ধ। আমার মনে হয়েছিল যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হয় ততদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির চেষ্টা ভিত্তিহীন, আমাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। এই কথাই আমি তখন (১৩১১ সালে) 'স্বদেশী সমাজ' -নামক বক্তৃতায় বলেছি।[১] কিন্তু কেবলমাত্র কথার দ্বারা শ্রোতার চিত্তকে জাগরিত ক'রে আমাদের দেশে ফল অল্পই পাওয়া যায়, তাই কেজো বুদ্ধি আমার না থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো গ্রাম নিয়ে সেগুলিকে ভিতরের দিক থেকে সচেতন করার কাজে আমি নিজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তখন আমার সঙ্গে কয়েকজন তরুণ যুবক সহযোগীরূপে ছিলেন। এই চেষ্টার ফলে একটি জিনিস আমার শিক্ষা হয়েছে, সেটি এই— দারিদ্র্য হোক, অজ্ঞান হোক, মানুষ যে গভীর দুঃখ ভোগ করে তার মূলে সত্যের ত্রুটি। মানুষের ভিতরে যে সত্য তার মূল হচ্ছে তার ধর্মবুদ্ধিতে; এই বুদ্ধির জোরে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের মিলন গভীর হয়, সার্থক হয়। এই সত্যটি যখনই বিকৃত হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনি তার জলাশয়ে জল থাকে না, তার ক্ষেত্রে শস্য সম্পূর্ণ ফলে না, সে রোগে মরে, অজ্ঞানে অন্ধ হয়ে

পড়ে। মনের যে দৈন্যে মানুষ আপনাকে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে সেই দৈন্যেই সে সকল দিকেই মরতে বসে, তখন বাইরের দিক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।

গ্রামে আগুন লাগল। দেখা গেল, সে আগুন সমস্ত গ্রামকে ভস্ম ক'রে তবে নিবল। এটি হল বাইরের কথা। ভিতরের কথা হচ্ছে, অন্তরের যোগে মানুষে মানুষে ভালো ক'রে মিলতে পারল না; সেই অমিলের ফাঁক দিয়েই আগুন বিস্তীর্ণ হয়। সেই অমিলের ফাঁকেই বুদ্ধিকে জীর্ণ করে, সাহসকে কাবু করে, সকল রকম কর্মকেই বাধা দেয় এইজন্যেই পূর্ব থেকে কাছে কোথাও জলাশয় প্রস্তুত ছিল না; এই-জন্যেই জলন্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে কেবল হাহাকারেই কণ্ঠ মিলিয়েছে, আর কিছুতেই তাদের শক্তির মিল হয় নি।

পর্বে পর্বে মানবসভ্যতা এগিয়েছে। প্রত্যেক পর্বেই মানুষ প্রশস্ততর ক'রে এই সত্যটাকেই আবিষ্কার করেছে। মানুষ যখন অরণ্যের মধ্যে ছিল তখন তার পরস্পরের মিলনের প্রাকৃতিক বাধা ছিল। পদে পদে সে বাইরের দিকে অবরুদ্ধ ছিল। এইজন্যে তার ভিতরের দিকের অবরোধও ঘোচে নি। অরণ্যের থেকে যখন সে নদীতে এসে পৌঁছল সে এমন-একটা বেগবান পথ পেলে যাতে দূরে দূরে তার যোগ বাইরের দিকে ও সেই সুযোগে ভিতরের দিকে প্রসারিত হতে থাকল। অর্থাৎ এই উপায়ে মানুষ আপন সত্যকে বড়ো ক'রে পেতে চলল। অরণ্যের বাইরে এই নদীর মুক্ত তীরে সভ্যতার এক নূতন অধ্যায়। প্রাচীন ভারতে গঙ্গা সভ্যতাকে পরিণতি ও বিস্তৃতি দেওয়ার পুণ্যকর্ম করেছে। পঞ্চনদের জলধারায় অভিষিক্ত ভূখণ্ডকে একদা ভারতবাসী পুণ্যভূমি ব'লে জানত, সেও এইজন্যেই। গঙ্গাও আপন জলধারার উপর দিয়ে মানুষের যোগের ধারাকে, সেইসঙ্গেই তার জ্ঞান ধর্ম কর্মের ধারাকেও, ভারতের

পশ্চিমগিরিতট থেকে আরম্ভ করে পূর্বসমুদ্রতট পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। সে কথা আজও ভারতবর্ষ ভুলতে পারে নি।

সভ্যতার আরণ্যপর্বে দেখি মানুষ বনের মধ্যে পশুপালনদ্বারা জীবিকানির্বাহ করছে; তখন ব্যক্তিগত ভাবে লোকে নিজের নিজের ভোগের প্রয়োজন সাধন করেছে। যখন কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হল তখন বহু লোকের অন্নকে বহু লোকে সমবেত হয়ে উৎপন্ন করতে লাগল। এই নিয়মিতভাবে প্রচুর অন্ন-উৎপাদনের দ্বারাই বহু লোকের একত্র অবস্থিতি সম্ভবপর হল। এইরূপে বহু লোকের মিলনেই মানবের সত্য, সেই মিলনেই তার সভ্যতা।

এক কালে জনকরাজা ছিলেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রতিনিধি। তিনি এই সভ্যতার অন্নময় ও জ্ঞানময় দুটি ধারাকে নিজের মধ্যে মিলিয়েছিলেন। কৃষি ও ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক। এই দুয়ের মধ্যেই ঐক্যসাধনার দুই পথ। সীতা তো জনকের শরীরিণী কন্যা ছিলেন না। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন যজ্ঞসম্ভবা রামায়ণের সীতা তেমনি কৃষিসম্ভবা। হলবিদারণ-রেখায় জনক তাকে পেয়েছিলেন। এই সীতাই, এই কৃষিবিদ্যাই, আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে রাক্ষসদমন বীরের সঙ্গিনী হয়ে সে-সময়কার সভ্যতার ঐক্যবন্ধনে আর্য-অনার্য সকলকে বেঁধে উত্তরে দক্ষিণে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

অন্নসাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত খণ্ডতার থেকে বৃহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল। ধর্মসাধনায় ব্রহ্মবিদ্যার সেই একই কাজ। যখন প্রত্যেক স্তবকারী আপন স্তবমন্ত্র ও বাহ্যপূজাবিধির মায়াগুণে আপন দেবতার উপরে বিশেষ প্রভাব-বিস্তারের আশা করত— তখন দেবত্ববোধের ভিতর দিয়ে মানুষ আত্মায় আত্মায় এবং আত্মায় পরমাত্মায় মিলনের ঐক্যবোধ সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ করে লাভ করেছিল।

বৈজ্ঞানিক মহলে এক কালে প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র সৃষ্টির মত প্রচলিত ছিল। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে তখন মানুষের ধারণা ছিল খণ্ডিত। ডারুইন যখন জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মূলগত ঐক্য আবিষ্কার ও প্রচার করলেন তখন এই একটি সত্যের আলোক বৈজ্ঞানিক ঐক্যবুদ্ধির পথ জড়ে জীবে অবারিত করে দিলে।

যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ভাবের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সত্যের উপলব্ধি ঐক্যবোধে নিয়ে যায় এবং ঐক্যবোধের দ্বারাই সকল-প্রকার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপারে ঐক্যবোধের যোগে য়ুরোপে জ্ঞান ও শক্তির আশ্চর্য উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এত উন্নতি মানুষের ইতিহাসে কোথাও আর-কখনো হয়েছে বলে আমরা জানি নে। এই উৎকর্ষলাভের আর-একটি কারণ এই যে, য়ুরোপের জ্ঞানসমৃদ্ধিকে পরিপূর্ণ করবার কাজে য়ুরোপের সকল দেশের চিত্তই মিলিত হয়েছে।

আবার অন্য দিকে দেখতে পাই, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রতিযোগিতায় য়ুরোপ মানুষের ঐক্যমূলক মহাসত্যকে একেবারেই অস্বীকার করেছে। তাই এই দিকে বিনাশের যজ্ঞহুতাশনে য়ুরোপ যেরকম প্রচণ্ড বলে ও প্রকাণ্ড পরিমাণে নররক্তের আহুতি দিতে বসেছে মানুষের ইতিহাসে কোনোদিন এমন কখনোই হয় নি। সত্যবিদ্রোহের মহাপাপে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ আর শান্তি নেই। জগৎ জুড়ে সর্বত্রই মানুষের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক চিত্ত মিথ্যায়, কপটতায়, নরঘাতী নিষ্ঠুরতায় নির্লজ্জভাবে কলুষিত। দেখে মনে হয়, সত্যবিচ্যুত মানুষ একটা বিশ্বব্যাপী আত্মসংহারের আয়োজনে তার সমস্ত ধনজন জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে।

সামাজিক দিকে মানুষ ধর্মকে স্বীকার করেছে, কিন্তু আর্থিক দিকে

করে নি। অর্থের উৎপাদন অধিকার ও ভোগ সম্বন্ধে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই জানে; এইখানেই সে আপন অহমিকা, আপন আত্মম্ভরিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অনিচ্ছুক। এইখানে তার মনের ভাবটা একলা-মানুষের ভাব, এইখানে তার নৈতিক দায়িত্ববোধ ক্ষীণ।

এই নিয়ে যখন আমরা বিপ্লবোন্মত্ত ভাব ধারণ করি তখন সাধারণতঃ ধনিক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধ নিয়েই উত্তেজনা প্রকাশ করি। কিন্তু অন্য ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ খাটে, অনেক সময়ে সে কথা ভুলে যাই। একজন আইনজীবী হয়তো একখানা দলিল মাত্র পড়ে কিম্বা আদালতে দাঁড়িয়ে গরিব মক্কেলের কাছে পাঁচ-সাত শো, হাজার, দু হাজার টাকা দাবি করেন; সেখানে তাঁরা অন্যপক্ষের অজ্ঞতা-অক্ষমতার ট্যাক্‌সো যথাসম্ভব শুষে আদায় করে নেন। কারখানার মালিক ধনিকেরাও ঠিক তাই করেন। পরস্পরের পেটের দায়ের অসাম্যের উপরেই তাঁদের শোষণের জোর। আমাদের দেশে কন্যাপক্ষের কাছে বরপক্ষ অসংগত পরিমাণে পণ দাবি করে; তার কারণ, বিবাহ করার অবশ্যকৃত্যতা সম্বন্ধে কন্যা ও বরের অবস্থার অসাম্য। কন্যার বিবাহ করতেই হবে, বরের না করলেও চলে, এই অসাম্যের উপর চাপ দিয়েই এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর দণ্ড দাবি করতে বাধা পায় না। এ স্থলে ধর্মোপদেশ দিয়ে ফল হয় না, পরস্পরের ভিতরকার অসাম্য দূর করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

বর্তমান যুগে ধনোপার্জনের অধ্যবসায়ে প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের নানা রুদ্ধ কক্ষ খোলবার নানা চাবি যখন থেকে বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছে তখন থেকে যারা সেই শক্তিকে আয়ত্ত করেছে এবং যারা করে নি তাদের মধ্যে অসাম্য অত্যন্ত অধিক হয়ে উঠেছে। এক কালে পণ্য-উৎপাদনের শক্তি, তার উপকরণ ও তার মুনফা ছিল অল্পপরিমিত; সুতরাং তার দ্বারা সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হতে পারে নি। কিন্তু এখন ধন জিনিসটা সমাজের

অন্য সকল সম্পদকেই ছাড়িয়ে গিয়ে এমন একটা বিপুল অসাম্য সৃষ্টি করছে যাতে সমাজের প্রাণ পীড়িত, মানবপ্রকৃতি অভিভূত হয়ে পড়ছে। ধন আজ যেন মানবশক্তির সীমা লঙ্ঘন করে দানবশক্তি হয়ে দাঁড়ালো, মনুষ্যত্বের বড়ো বড়ো দাবি তার কাছে হীনবল হয়েছে। যন্ত্রসহায় পুঞ্জীভূত ধন আর সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক শক্তির মধ্যে এমন অতিশয় অসামঞ্জস্য যে, সাধারণ মানুষকে পদে পদে হার মানতে হচ্ছে। এই অসামঞ্জস্যের সুযোগটা যাদের পক্ষে তারাই অপর পক্ষকে একেবারে অন্তিম মাত্রা পর্যন্ত দলন করে নিজের অতিপুষ্টি সাধন করে এবং ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠে সমাজদেহের ভারসামঞ্জস্যকে নষ্ট করতে থাকে।

সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে সামঞ্জস্য। তাই যখনই সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে এমন-সকল রিপু প্রবল হয়— এমন-সকল ব্যবস্থাবিপর্যয় ঘটে যা সমাজবিরুদ্ধ, যাতে করে অল্প লোকে বহু লোকের সংস্থানকে নষ্ট করে, তাদের সকলকে আপন ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করতে থাকে, তখন হয় সমাজ সেই অত্যাচারে জীর্ণ হয়ে বহু লোকের দুঃখ ও দাস্য -ভারে আধ-মরা হয়ে থাকে নয় তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

য়ুরোপে এই বিদ্রোহের বেগ অনেক দিন থেকেই ক্রমে বেড়ে উঠছে। য়ুরোপে সকল-রকম অসামঞ্জস্য আপন সংশোধনের জন্যে সর্বপ্রথমেই মার-কাটের পথ নেবার দিকেই ঝোঁকে।

তার কারণ য়ুরোপীয়ের রক্তের মধ্যে একটা সংহারের প্রবৃত্তি আছে। দেশে বিদেশে অকারণে পশুপক্ষী ধ্বংস ক'রে তারা এই হিংসাবৃত্তির তৃপ্তি ক'রে বেড়ায়; সেইজন্যেই যখন কোনো-একটা বিশেষ অবস্থার ক্রিয়া তাদের পছন্দ না হয় তখন সেই অবস্থার মূলে যে আইডিয়া আছে তার উপরে হস্তক্ষেপ করবার আগেই তারা মানুষকে মেরে উজাড় করে দিতে

চায়। বাতাসে যখন রোগের বীজ ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সেই বীজ যে মানুষকে পেয়ে বসেছে সেই মানুষটাকে মেরে ফেলে রোগের বীজ মরে না। বর্তমান কালে সমাজে অতিপরিমাণে যে আর্থিক অসামঞ্জস্য প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে তার মূলে আছে লোভ। লোভ মানুষের চিরদিনই আছে। কিন্তু যে পরিমাণে থাকলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি করে না, বরঞ্চ তার কাজে লাগে, সেই সাধারণ সীমা খুব বেশি ছাড়িয়ে যায় নি। কিন্তু এখন সেই লোভের আকর্ষণ প্রচণ্ড প্রবল; কেননা, লাভের আয়তন প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে। অর্থ-উৎপাদনের উপায়গুলি আগেকার চেয়ে বহুশক্তিসম্পন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত লোভের কারণগুলি বাইরে আছে ততক্ষণ এক মানুষের মধ্যে সেটাকে তাড়া করলে সে আর-এক মানুষের উপর চাপবে; এমন-কি যে লোকটা আজ তাড়া করছে সেই লোকটারই কাঁধে কাল ভর দিয়ে বসবার আশঙ্কা খুবই আছে। লোভটাকে অপরিমিতরূপে তৃপ্ত করবার উপায় এক জায়গায় বেশি ক'রে সংহত হলেই সেটা তার আকর্ষণশক্তির প্রবলতায় লোকচিত্তকে কেবলই বিচলিত করতে থাকে। সেটাকে যথাসম্ভব সকলের মধ্যে চারিয়ে দিতে পারলে তবে সেই আন্দোলন থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। অনেক মানুষের মধ্যে যে অর্থকরী শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বড়ো মূলধন তাদের নিজের আয়ত্ত ক'রে বড়ো ব্যাবসা ফাঁদে; এই সংঘবদ্ধ শক্তির কাছে বিচ্ছিন্ন শক্তিকে হার মানতে হয়। এর একটিমাত্র উপায় বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি যদি স্বতঃই একত্রিত হতে পারে এবং সম্মিলিত ভাবে ধন উৎপাদন করে। তা হলে ধনের স্রোতটা সকলের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে। ধনীকে মেরে এ কাজ সম্পন্ন হয় না, ধনকে সকলের মধ্যে মুক্তিদানের দ্বারাই হতে পারে, অর্থাৎ ঐক্যের সত্য অর্থনীতির মধ্যেও প্রচলিত হতে পারলে তবেই অসাম্যগত বিরোধ ও দুর্গতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।

প্রাচীন যুগে অতিকায় জন্তুসকল এক দেহে প্রভূত মাংস ও শক্তি পুঞ্জীভূত করেছিল। মানুষ অতিকায় রূপ ধরে তাদের পরাস্ত করে নি। ছোটো ছোটো দুর্বল মানুষ পৃথিবীতে এল। এক বৃহৎ জীবের শক্তিকে তারা পরাস্ত করতে পারল বহু বিচ্ছিন্ন জীবের শক্তির মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি ক'রে। আজ প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের অন্তর ও বাহ্যশক্তির ঐক্যে বিরাট, শক্তিসম্পন্ন। তাই মানুষ পৃথিবীর জীবলোক জয় করছে।

আজ কিছুকাল থেকে মানুষ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সেই নূতন আবিষ্কারেরই নাম হয়েছে সমবায়-প্রণালীতে ধন-উপার্জন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে এমন দিন এসেছে। আর্থিক অসাম্যের উপদ্রব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মার-কাট ক'রে নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে যে মানবনীতির স্থান ছিল না ব'লেই এত অশান্তি ছিল সেখানে সেই মানব-সত্যের আবির্ভাব হচ্ছে। একদা দুর্বল জীব প্রবল জীবের রাজ্যে জয়ী হয়েছে, আজও দুর্বল হবে জয়ী— প্রবলকে মেরে নয়, নিজের শক্তিকে ঐক্যদ্বারা প্রবলরূপে সত্য ক'রে। সেই জয়ধ্বজা দূর হতে আমি দেখতে পাচ্ছি। সমবায়ের শক্তি দিয়ে আমাদের দেশে সেই জয়ের আগমনী সূচিত হচ্ছে।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডেন্মার্কের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটি কথা তিনি ভুলেছেন, ভারতবর্ষের অবস্থা ও ডেন্মার্কের অবস্থা ঠিক সমান নয়। ডেন্মার্ক্ আজ dairy farm-এ যে উন্নতি করেছে তার মূলে শুধু সমবায় নয়; সেখানকার গবর্মেণ্টের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় dairy farm-এর উন্নতির জন্য প্রজাসাধারণের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। ডেন্মার্কের মতো স্বাধীন দেশেই সরকারের তরফ থেকে সাধারণকে এমন সাহায্য করা সম্ভব।

ডেন্মার্কের একটি মস্ত সুবিধা এই যে, সে দেশ রণসজ্জার বিপুল ভারে পীড়িত নয়। তার সমস্ত অর্থই প্রজার বিচিত্র কল্যাণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত হতে পারে। প্রজার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সম্পদের জন্যও আমাদের রাজস্বের ভারমোচন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। প্রজাহিতের জন্য রাজস্বের যে উদ্‌বৃত্ত থাকে তা শিক্ষাবিধান প্রভৃতি কাজের জন্য যৎসামান্য। এখানেও আমাদের সমস্যা হচ্ছে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির নিরতিশয় অসাম্য। প্রজার শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি কল্যাণের জন্যে সমবায়-প্রণালীর দ্বারাই, নিজের শক্তি-উপলব্ধি-দ্বারাই অসাম্যজনিত দৈন্যদুর্গতির উপর ভিতর থেকে জয়ী হতে হবে। এই কথাটি আমি বহুকাল থেকে বারবার বলেছি, আজও বারবার বলতে হবে।

আমাদের দেশে একদিন ছিল ধনীর ধনের উপর সমাজের দাবি। ধনী তার ধনের দায়িত্ব লোকমতের প্রভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হত। তাতে তখনকার দিনে কাজ চলেছে, সমাজ বেঁচেছে। কিন্তু সেই দানদাক্ষিণ্যের প্রথা থাকাতে সাধারণ লোকে আত্মবশ হতে শিখতে পারে নি। তারা অনুভব করে নি যে, গ্রামের অন্ন ও জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ধর্ম ও আনন্দ তাদের প্রত্যেকের শুভ-ইচ্ছার সমবায়ের উপরেই নির্ভর করে। সেই কারণেই আজ যখন আমাদের সমাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে, ধনের ভোগ যখন একান্ত ব্যক্তিগত হল, ধনের দায়িত্ব যখন লোকহিতে সহজভাবে নিযুক্ত নয়, তখন লোক আপন হিতসাধন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছে। আজ ধনীরা শহরে এসে ধনভোগ করছে ব'লেই গ্রামের সাধারণ লোকেরা আপন ভাগ্যের কার্পণ্য নিয়ে হাহাকার করছে। তাদের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই নিজের হাতে এ কথা বিশ্বাস করবার শক্তি তাদের নেই। গোড়ায় অন্নের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, এই বিশ্বাসকে সার্থকভাবে প্রমাণ করা যায়, তা হলেই দেশ ক্রমে সকল

দিকেই বাঁচবে। অতএব সমবায়নীতির দ্বারা এই সত্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা আমাদের আজকের দিনের কর্তব্য। লঙ্কার বহুখাদ্যখাদক দশমুণ্ডধারী বহু-অর্থ-গৃধ্নু দশ-হাত-ওয়ালা রাবণকে মেরেছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরের সংঘবদ্ধশক্তি। একটি প্রেমের আকর্ষণে সেই সংঘটি বেঁধেছিল। আমরা যাঁকে রামচন্দ্র বলি তিনিই প্রেমের দ্বারা দুর্বলকে এক করে তাদের ভিতর প্রচণ্ড শক্তিবিকাশ করেছিলেন। আজ আমাদের উদ্ধারের জন্যে সেই প্রেমকে চাই, সেই মিলনকে চাই।

শ্রাবণ ১৩৩৪

১ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে এবং 'সমূহ' গ্রন্থে সংকলিত আছে।

সমবায়নীতি

সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগর আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। দেশের প্রাণ যে নগরে বেশি বিকাশ পায় তা নয়; দেশের শক্তি নগরে বেশি সংহত হয়ে ওঠে, এই তার গৌরব।

সামাজিকতা হল লোকালয়ের প্রাণ। এই সামাজিকতা কখনোই নগরে জমাট বাঁধতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে, নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সেখানে স্বভাবতই আলগা হয়ে থাকে। আর-একটা কারণ এই যে, নগরে ব্যবসায় ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন ও সুযোগের অনুরোধে জনসংখ্যা অত্যন্ত মস্ত হয়ে ওঠে। সেখানে মুখ্যত মানুষ নিজের আবশ্যককে চায়, পরস্পরকে চায় না। এইজন্যে শহরে এক পাড়াতেও যারা থাকে তাদের মধ্যে চেনাশুনো না থাকলেও লজ্জা নেই। জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাল্যকালে দেখেছি আমাদের পাড়ার লোকে আমাদের বাড়িতে আত্মীয়ভাবে নিয়তই মেলামেশা করত। আমাদের পুকুরে আশপাশের সকল লোকেরই স্নান, প্রতিবেশীরা আমাদের বাগানে অনেকেই হাওয়া খেতে আসতেন এবং পূজার ফুল তুলতে কারোও বাধা ছিল না। আমাদের বারান্দায় চৌকি পেতে যে যখন খুশি তামাক দাবি করত। বাড়িতে ক্রিয়াকর্মের ভোজে ও আমোদ-আহ্লাদে পাড়ার সকল লোকেরই অধিকার এবং আনুকূল্য ছিল। তখনকার ইমারতে দালানের সংলগ্ন একাধিক আঙিনার ব্যবস্থা কেবল যে আলোছায়ার অবাধ প্রবেশের জন্য তা নয়, সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশের জন্যে। তখন নিজের প্রয়োজনের মাঝখানে সকলের প্রয়োজনের জায়গা রাখতে হত;

নিজের সম্পত্তি একেবারে কষাকষি করে নিজেরই ভোগের মাপে ছিল না। ধনীর ভাণ্ডারের এক দরজা ছিল তার নিজের দিকে, এক দরজা সমাজের দিকে। তখন যে ছিল ধনী তার সৌভাগ্য চারি দিকের লোকের মধ্যে ছিল ছড়ানো। তখন যাকে বলত ক্রিয়াকর্ম তার মানেই ছিল রবাহূত অনাহূত সকলকেই নিজের ঘরের মধ্যে স্বীকার করার উপলক্ষ্য।

এর থেকে বুঝতে পারি, বাংলাদেশের গ্রামের যে সামাজিক প্রকৃতি শহরেও সেদিন তা স্থান পেয়েছে। শহরের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের চেহারার মিল তেমন না থাকলেও চরিত্রের মিল ছিল। নিঃসন্দেহই পুরাতন কালে আমাদের দেশের বড়ো বড়ো নগরগুলি ছিল এই শ্রেণীর। তারা আপন নাগরিকতার অভিমান-সত্ত্বেও গ্রামগুলির সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করত। কতকটা যেন বড়ো ঘরের সদর-অন্দরের মতো। সদরে ঐশ্বর্য এবং আড়ম্বর বেশি বটে, কিন্তু আরাম এবং অবকাশ অন্দরে ; উভয়ের মধ্যে হৃদয়সম্বন্ধের পথ খোলা।

এখন তা নেই, এ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। দেখতে দেখতে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নগর একান্ত নগর হয়ে উঠল, তার খিড়কির দরজা দিয়েও গ্রামের আনাগোনার পথ রইল না। একেই বলে 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ' ; গ্রামগুলি শহরকে চারি দিকেই ঘিরে আছে, তবু শত যোজন দূরে।

এরকম অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। বলা আবশ্যক এটা কেবল আমাদের দেশেরই আধুনিক লক্ষণ নয়, এটা বর্তমান কালেরই সাধারণ লক্ষণ। বস্তুত পাশ্চাত্য হাওয়ায় এই সামাজিক আত্মবিচ্ছেদের বীজ ভেসে এসে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এতে যে কেবল মানবজাতির সুখ ও শান্তি নষ্ট করে তা নয়, এটা ভিতরে ভিতরে

প্রাণঘাতক। অতএব এই সমস্যার কথা আজ সকল দেশের লোককেই ভাবতে হবে।

য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে সভ্যতা বলে সেই সভ্যতা সাধারণ প্রাণকে শোষণ ক'রে বিশেষ শক্তিকে সংহত ক'রে তোলে; সে যেন বাঁশগাছে ফুল ধরার মতো, সে ফুল সমস্ত গাছের প্রাণকে নিঃশেষিত করে। বিশিষ্টতা বাড়তে বাড়তে এক-ঝোঁকা হয়ে ওঠে; তারই কেন্দ্রবহির্গত ভারে সমস্তটার মধ্যে ফাটল ধরতে থাকে, শেষকালে পতন অনিবার্য। য়ুরোপে সেই ফাটল ধরার লক্ষণ দেখতে পাই নানা আকারের আত্ম-বিদ্রোহে। কু-ক্লুক্স্-ক্ল্যান, সোভিয়েট, ফ্যাসিস্ট্, কর্মিক বিদ্রোহ, নারী-বিপ্লব প্রভৃতি বিবিধ আত্মঘাতীরূপে সেখানকার সমাজের গ্রন্থিভেদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে একস্প্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই। ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায়; তাতে ক্ষুদ্র-বিশিষ্টের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ-সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে উঠতে থাকে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। আর্থিক রাষ্ট্রিক বা জনপ্রভুত্বের শক্তিচর্চার জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থা আবশ্যক। সেই বিধি সামাজিক বিধি নয়, এই বিধানে মানবধর্মের চেয়ে যন্ত্রধর্ম প্রবল। এই যন্ত্রব্যবস্থাকে আয়ত্ত যে করতে পারে সেই শক্তি লাভ করে। এই কারণে নগর প্রধানত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এখানে সহযোগিতাবৃত্তি যথোচিত উৎসাহ পায় না।

শক্তি-উদ্‌ভাবনার জন্যে অহমিকা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যখনই তা পরিমাণ লঙ্ঘন করে তখনই তার ক্রিয়া সাংঘাতিক হয়। আধুনিক সভ্যতায় সেই পরিমিতি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, এ

সভ্যতা বিরলাঙ্গিক নয়, বহুলাঙ্গিক। এর প্রকাশ ও রক্ষার জন্যে বহু আয়োজনের দরকার ; একে ব্যয় করতে হয় বিস্তর। এই সভ্যতায় সম্বলের স্বল্পতা একটা অপরাধেরই মতো, কেননা বিপুল উপকরণের ভিত্তির উপরেই এ দাঁড়িয়ে আছে ; যেখানেই অর্থদৈন্য সেখানেই এর বিরুদ্ধতা। বিদ্যাই হোক, স্বাস্থ্যই হোক, আমোদ-আহ্লাদ হোক, রাস্তাঘাট আইন-আদালত যানবাহন অশন আসন যুদ্ধচালনা শান্তিরক্ষা সমস্তই বহুধনসাধ্য। এই সভ্যতা দরিদ্রকে প্রতিক্ষণেই অপমানিত করে। কেননা, দারিদ্র্য একে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে।

এই কারণে ধন বর্তমানকালে সকল প্রভাবের নিদান এবং সকলের চেয়ে সমাদৃত। বস্তুত আজকালকার দিনের রাষ্ট্রনীতির মূলে রাজপ্রতাপের লোভ নেই, ধন-অর্জনের জন্য বাণিজ্যবিস্তারের লোভ। সভ্যতা যখন এখনকার মতো এমন বহুলাঙ্গিক ছিল না তখন পণ্ডিতের গুণীর বীরের দাতার কীর্তিমানের সমাদর ধনীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল ; সেই সমাদরের দ্বারা যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের সম্মান করা হত। তখন ধনসঞ্চয়ীদের 'পরে সাধারণের অবজ্ঞা ছিল। এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (parasite)। তাই শুধু ধনের অর্জন নয়, ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। অপদেবতার পূজায় মানুষের শুভবুদ্ধিকে নষ্ট করে, আজ পৃথিবী জুড়ে তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। মানুষ মানুষের এত বড়ো প্রবল শত্রু আর কোনো-দিন ছিল না, কারণ ধনলোভের মতো এমন নিষ্ঠুর এবং অন্যায়পরায়ণ প্রবৃত্তি আর নেই। আধুনিক সভ্যতার অসংখ্যবাহুচালনায় এই লোভই সর্বত্র উন্মথিত এবং এই লোভপরিতৃপ্তির আয়োজন তার অন্য-সকল উদ্যোগের চেয়ে পরিমাণে বেড়ে চলেছে।

কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই জানতে হবে যে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কারণ, লোভ সামাজিকতার প্রতিকূল প্রবৃত্তি। যাতেই মানুষের

সামাজিকতাকে দুর্বল করে তাতেই পদে পদে আত্মবিচ্ছেদ ঘটায়, অশান্তির আগুন কিছুতেই নিবতে দেয় না, শেষকালে মানুষের সমাজস্থিতি বিভক্ত হয়ে পঞ্চত্ব পায়।

পাশ্চাত্য দেশে আজ দেখতে পাচ্ছি, যারা ধন-অর্জন করছে এবং যারা অর্জনের বাহন তাদের মধ্যে কোনোমতেই বিরোধ মিটছে না। মেটবার উপায়ও নেই। কেননা, যে মানুষ টাকা করছে তারও লোভ যতখানি যে মানুষ টাকা জোগাচ্ছে তারও লোভ তার চেয়ে কম নয়। সভ্যতার সুযোগ যথেষ্টপরিমাণে ভোগ করবার জন্যে প্রচুর ধনের আবশ্যকতা উভয়পক্ষেই। এমন স্থলে পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি কোনো এক জায়গায় এসে থামবে, এমন আশা করা যায় না।

লোভের উত্তেজনা, শক্তির উপাসনা, যে অবস্থায় সমাজে কোনো কারণে অসংযত হয়ে দেখা দেয় সে অবস্থায় মানুষ আপন সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব-সাধনার দিকে মন দিতে পারে না; সে প্রবল হতে চায়, পরিপূর্ণ হতে চায় না। এই রকম অবস্থাতেই নগরের আধিপত্য হয় অপরিমিত, আর গ্রামগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে। তখন যত-কিছু সুবিধা সুযোগ, যত-কিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জিত হয়। গ্রামগুলি দাসের মতো অন্ন জোগায়, এবং তার পরিবর্তে কোনোমতে জীবনধারণ করে মাত্র। তাতে সমাজের মধ্যে এমন-একটা ভাগ হয় যাতে এক দিকে পড়ে তীব্র আলো, আর-এক দিকে গভীর অন্ধকার। য়ুরোপের নাগরিক সভ্যতা মানুষের সর্বাঙ্গীণতাকে এই রকমে বিচ্ছিন্ন করে। প্রাচীন গ্রীসের সমস্ত সভ্যতা তার নগরে সংহত ছিল। তাতে ক্ষণকালের জন্য ঐশ্বর্যসৃষ্টি করে সে লুপ্ত হয়েছে। প্রভু এবং দাসের মধ্যে তার ছিল একান্ত ভাগ। প্রাচীন ইটালি ছিল নাগরিক। কিছুকাল সে প্রবলভাবে শক্তির সাধনা করেছিল। কিন্তু শক্তির প্রকৃতি সহজেই অসামাজিক— সে শক্তিমান ও শক্তির বাহনকে

একান্ত বিভক্ত করে দেয়, তাতে ক'রে অল্পসংখ্যক প্রভু বহুসংখ্যক দাসের পরাশিত হয়ে পড়ে, এই পারাশিত্য মনুষ্যত্বের ভিত্তি নষ্ট করে।

পাশ্চাত্য মহাদেশের সভ্যতা নাগরিক ; সেখানকার লোকে কেবল নিজের দেশে নয়, জগৎ জুড়ে মানবলোককে আলো-অন্ধকারে ভাগ করছে। তাদের এত বেশি আকাজ্ঞা যে, সে আকাজ্ঞার নিবৃত্তি সহজে তাদের নিজের অধিকারের মধ্যে হতেই পারে না। ইংলণ্ডের মানুষ যে ঐশ্বর্যকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে জানে তাকে লাভ ও রক্ষা করতে গেলে ভারতবর্ষকে অধীনরূপে পেতেই হবে ; তাকে ত্যাগ করতে হলে আপন অতিভোগী সভ্যতার আদর্শকে খর্ব না করে তার উপায় নেই। যে শক্তিসাধনা তার চরম লক্ষ্য সেই সাধনার উপকরণরূপে তার পক্ষে দাস-জাতির প্রয়োজন আছে। আজ তাই সমস্ত ব্রিটিশ জাতি সমস্ত ভারত-বর্ষের পরাশিতরূপে বাস করছে। এই কারণেই য়ুরোপের বড়ো বড়ো জাতি এশিয়া-আফ্রিকাকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে ব্যস্ত ; নইলে তাদের ভোগবহুল সভ্যতাকে আধ-পেটা থাকতে হয়। এই কারণে বৃহদাংশিকের উপর ন্যূনাংশিকের পারাশিত্য তাদের নিজের দেশেও বড়ো হয়ে উঠেছে। অতিভোগের সম্বল সর্বসাধারণের মধ্যে সমতুল্য হতেই পারে না, অল্পলোকের সঞ্চয়কে প্রভূত করতে গেলে বহুলোককে বঞ্চিত হতেই হয়। পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্যাই আজ সবচেয়ে উগ্রভাবে উদ্যত। সেখানে কর্মিক ও ধনিকে যে বিরোধ, তার মূলে এই অপরিমিত ভোগের জন্য সংহত লোভ। তাতে করেই ধনিক ও ধনের বাহনে একান্ত বিভাগ, যেমন বিভাগ বিদেশীয় প্রভুজাতির সঙ্গে দাস-জাতির। তারা অত্যন্ত পৃথক্। এই অত্যন্ত পার্থক্য মানবধর্মবিরুদ্ধ ; মানবের পক্ষে মানবিক ঐক্য যেখানেই পীড়িত সেইখানেই বিনাশের

শক্তি প্রকাশ্য বা গোপন ভাবে বড়ো হয়ে ওঠে। এইজন্যেই মানবসমাজে প্রভু প্রত্যক্ষভাবে মারে দাসকে, কিন্তু দাস প্রভুকে অপ্রত্যক্ষভাবে তার চেয়ে বড়ো মার মারে; সে ধর্মবুদ্ধিকে বিনাশ করতে থাকে। মানবের পক্ষে সেইটে গোড়া ঘেঁষে সাংঘাতিক; কেননা অন্নের অভাবে মরে পশু, ধর্মের অভাবে মরে মানুষ।

ঈসপের গল্পে আছে, সতর্ক হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিকেই সে বাণ খেয়ে মরেছে। বর্তমান মানবসভ্যতায় কানা দিক হচ্ছে তার বৈষয়িক দিক। আজকের দিনে দেখি, জ্ঞান-অর্জনের দিকে য়ুরোপের একটা বৃহৎ ও বিচিত্র সহযোগিতা, কিন্তু বিষয়-অর্জনের দিকে তার দারুণ প্রতিযোগিতা। তার ফলে বর্তমান যুগে জ্ঞানের আলোক য়ুরোপের এক প্রদীপে সহস্রশিখায় জ্বলে উঠে আধুনিক কালকে অত্যুজ্জ্বল করে তুলেছে। জ্ঞানের প্রভাবে য়ুরোপ পৃথিবীর অন্যান্য সকল মহাদেশের উপর মাথা তুলেছে। মানুষের জ্ঞানের যজ্ঞে আজ য়ুরোপীয় জাতিই হোতা, সেই পুরোহিত; তার হোমানলে সে বহু দিক থেকে বহু ইন্ধন একত্র করছে, এ যেন কখনো নিববে না, এমন এর আয়োজন এবং প্রভাব। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞানের এমন বহুব্যাপক সমবায়নীতি আর কখনো দেখা যায় নি। ইতিপূর্বে প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্রভাবে নিজের বিদ্যা নিজে উদ্‌ভাবন করেছে। গ্রীসের বিদ্যা প্রধানত গ্রীসের, রোমের বিদ্যা রোমের, ভারতের চীনেরও তাই। সৌভাগ্যক্রমে য়ুরোপীয় মহাদেশের দেশপ্রদেশগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, তাদের প্রাকৃতিক বেড়াগুলি দুর্লঙ্ঘ্য নয়— অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমি বা উত্তুঙ্গ গিরিমালা -দ্বারা তারা একান্ত পৃথক্‌কৃত হয় নি। তার পরে এক সময়ে এক ধর্ম য়ুরোপের সকল দেশকেই অধিকার করেছিল; শুধু তাই নয়, এই ধর্মের কেন্দ্রস্থল অনেক কাল পর্যন্ত ছিল এক রোমে।

এক লাটিন ভাষা অবলম্বন করে অনেক শতাব্দী ধরে য়ুরোপের সকল দেশ বিদ্যালোচনা করেছে। এই ধর্মের ঐক্য থেকেই সমস্ত মহাদেশ জুড়ে বিদ্যার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্মের বিশেষ প্রকৃতিও ঐক্যমূলক, এক খৃস্টের প্রেমই তার কেন্দ্র এবং সর্বমানবের সেবাই সেই ধর্মের অনুশাসন। অবশেষে লাটিনের ধাত্রীশালা থেকে বেরিয়ে এসে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশ আপন ভাষাতেই বিদ্যার চর্চা করতে আরম্ভ করলে। কিন্তু সমবায়নীতি অনুসারে নানা দেশের সেই বিদ্যা এক প্রণালীতে সঞ্চারিত ও একই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে আরম্ভ করলে। এর থেকেই জন্মালো পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমবায়মূলক জ্ঞানের সভ্যতা— বিদ্যার ক্ষেত্রে বহু প্রত্যঙ্গের সংযোগে একাঙ্গীকৃত সভ্যতা। আমরা প্রাচ্য সভ্যতা কথাটা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এ সভ্যতা এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিত্তের সমবায়-মূলক নয় ; এর যে পরিচয় সে নেতিবাচক, অর্থাৎ এ সভ্যতা য়ুরোপীয় নয় এইমাত্র। নতুবা আরবের সঙ্গে চীনের বিদ্যা শুধু মেলে নি যে তা নয়, অনেক বিষয় তারা পরস্পরের বিরুদ্ধ। সভ্যতার বাহ্যিক রূপ ও আন্তরিক প্রকৃতি তুলনা করে দেখলে ভারতীয় হিন্দুর সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়া-বাসী সেমেটিকের অত্যন্ত বৈষম্য। এই উভয়ের চিত্তের ঐশ্বর্য পৃথক্ ভাণ্ডারে জমা হয়েছে। এই জ্ঞান-সমবায়ের অভাবে এশিয়ার সভ্যতা প্রাচীন কালের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে খণ্ডিত। ঐতিহাসিক সংঘাতে কোনো কোনো অংশে কিছু-কিছু দেনা-পাওনা হয়ে গেছে, কিন্তু এশিয়ার চিত্ত এক কলেবর ধারণ করে নি। এইজন্য যখন 'প্রাচ্য সভ্যতা' শব্দ ব্যবহার করি তখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের সভ্যতাকেই দেখতে পাই।

এশিয়ার এই বিচ্ছিন্ন সভ্যতা বর্তমান কালের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, য়ুরোপ পেরেছে ; তার কারণ সমবায়নীতি

মনুষ্যত্বের মূলনীতি, মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে। সভ্যতা শব্দের অর্থ ই হচ্ছে মানুষের একত্র সমাবেশ।

কিন্তু এই য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যেই কোন্‌খানে বিনাশের বীজ-রোপণ চলেছে? যেখানে তার মানবধর্মের বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ যেখানে তার সমবায় ঘটতে পারে নি। সে হচ্ছে তার বিষয়ব্যাপারের দিক। এইখানে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরুদ্ধ। এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রকাণ্ড হয়েছে, তার কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের আয়োজন ও আয়তন আজ অত্যন্ত বিপুলীকৃত। তার ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতায় একটা অদ্ভুত পরস্পরবিরুদ্ধতা জেগেছে। এক দিকে দেখছি মানুষকে বাঁচাবার বিদ্যা সেখানে প্রত্যহ দ্রুতবেগে অগ্রসর— ভূমিতে উর্বরতা, দেহে আরোগ্য, জীবনযাত্রায় জড় বাধার উপর কর্তৃত্ব মানুষ এমন করে আর কোনোদিন লাভ করে নি; এরা যেন দেবলোক থেকে অমৃত আহরণ করতে বসেছে। আবার আর-এক দিক ঠিক এর বিপরীত। মৃত্যুর এমন বিরাট সাধনা এর আগে কোনোদিন দেখা যায় নি। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশ এই সাধনায় মহোৎসাহে প্রবৃত্ত। এত বড়ো আত্মঘাতী অধ্যবসায় এর আগে মানুষ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারত না। জ্ঞানসমবায়ের ফলে য়ুরোপ যে প্রচণ্ড শক্তিকে হস্তগত করেছে আত্মবিনাশের জন্য সেই শক্তিকেই য়ুরোপ ব্যবহার করবার জন্যে উদ্যত। মানুষের সমবায়নীতি ও অসমবায়নীতির বিরুদ্ধ-ফলের এমন প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখি নি। জ্ঞানের অন্বেষণে বর্তমান যুগে মানুষ বাঁচাবার পথে চলেছে, আর বিষয়ের অন্বেষণে মারবার পথে। শেষ পর্যন্ত কার জয় হবে সে কথা বলা শক্ত হয়ে উঠল।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্বাসিত করলে তবে আপদ মেটে। এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।

চতুষ্পদ পশুদের আছে চার পা, হাত নেই; জীবিকার জন্যে যতটুকু কাজ আবশ্যক তা তারা এক রকম করে চালিয়ে নেয়। সেই কোনো-এক রকমে চালানোতেই দৈন্য ও পরাভব। মানুষ ভাগ্যক্রমে পেয়েছে দুটো হাত, কেবলমাত্র কাজ করবার জন্যে। তাতে তার কাজের শক্তি বিস্তর বেড়ে গেছে। সেই সুবিধাটুকু পাওয়াতে জীবজগতে অন্য-সব জন্তুর উপরে সে জয়ী হয়েছে; আজ সমস্ত পৃথিবী তার অধিকারে। তার পর থেকে যখনই কোনো উপায়ে মানুষ যন্ত্রসাহায্যে আপন কর্মশক্তিকে বাড়ায় তখনই জীবনের পথে তার জয়যাত্রা এগিয়ে চলে। এই কর্মশক্তির অভাবের দিকটা পশুদের দিক, এর পূর্ণতাই মানুষের। মানুষের এই শক্তিকে খর্ব করে রাখতে হবে এমন কথা কোনোমতেই বলা চলে না, বললেও মানুষ শুনবে না। মানুষের কর্মশক্তির বাহন যন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারে নি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য, যেমন অনিবার্য মানুষের কাছে পশুর পরাভব।

শক্তিকে খর্ব করব না, অথচ সংহত শক্তি-দ্বারা মানুষকে আঘাত করা হবে না, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কী করে হতে পারে সেইটেই ভেবে দেখবার বিষয়।

শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ এক জন বা এক দল মানুষ কোনো সুযোগে নিজের হাতে নেয় তখনই বাকি লোকদের পক্ষে মুশকিল ঘটে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদা সকল দেশেই রাজশক্তি এক জনের এবং তারই অনুচরদের মধ্যেই প্রধানত সংকীর্ণ হয়ে ছিল। এমন অবস্থায় সেই এক জন বা কয়েক জনের ইচ্ছাই আর-সকলের ইচ্ছাকে অভিভূত করে রাখে। তখন অন্যায় অবিচার শাসনবিকার থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে শক্তিমানদের কাছে ধর্মের দোহাই পাড়তে হত। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। অধিকাংশ স্থলেই শক্তিমানের কান ধর্মের

কাহিনী শোনবার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই কোনো কোনো দেশের প্রজারা জোর করে রাজার শক্তি হরণ করেছে। তারা এই কথা বলেছে যে, 'আমাদেরি সকলের শক্তি নিয়ে রাজার শক্তি। সেই শক্তিকে এক জায়গায় সংহত করার দ্বারাই আমরা বঞ্চিত হই। যদি সেই শক্তিকে আমরা প্রত্যেকে ব্যবহার করবার উপায় করতে পারি, তা হলে আমাদের শক্তি-সমবায়ে সেটা আমাদের সম্মিলিত রাজত্ব হয়ে উঠবে।' ইংলণ্ডে সেই সুযোগ ঘটেছে। অন্যান্য অনেক দেশে যে ঘটে নি তার কারণ, শক্তিকে ভাগ করে নিয়ে তাকে কর্মে মিলিত করবার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তি সকল জাতির নেই।

অর্থশক্তি সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনীসম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমতো করে বলতে পারে যে 'আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব' তা হলে সেই হয়ে গেল মূলধন। স্বভাবের দোষে ও দুর্বলতায় কোনো বিষয়েই যাদের মেলবার ও মেলাবার সাধ্য নেই তাদের দুঃখ পেতেই হবে। অন্যকে গাল পেড়ে বা ডাকাতি করে তাদের স্থায়ী সুবিধা হবে না।

বিষয়ব্যাপারে মানুষ অনেক কাল থেকে আপন মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করে আসছে। এই ক্ষেত্রে সে আপন শক্তিকে একান্তভাবে আপনারই লোভের বাহন করেছে। সংসারে তাই এইখানেই মানুষের দুঃখ ও

অপমান এত বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত। এইখানেই অসংখ্য দাসকে বল্গায় বেঁধে ও চাবুক মেরে ধনের রথ চালানো হচ্ছে। আর্তরা ও আর্তবন্ধুরা কেবল ধর্মের দোহাই পেড়েছে, বলেছে 'অর্থও জমাতে থাকো, ধর্মকেও খুইয়ো না'। কিন্তু শক্তিমানের ধর্মবুদ্ধির দ্বারা দুর্বলকে রক্ষা করার চেষ্টা আজও সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। অবশেষে একদিন দুর্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে যে, 'আমাদেরই বিচ্ছিন্ন বল বলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে বল দিয়েছে। বাইরে থেকে তাকে আক্রমণ করে তাকে ভাঙতে পারি, কিন্তু তাকে জুড়তে পারি নে; জুড়তে না পারলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত ক'রে অর্থশক্তিকে সার্বসাধারণের জন্যে লাভ করা।'

একেই বলে সমবায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোকব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ, এত ঈর্ষা দ্বেষ মিথ্যাচার নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।

পৃথিবী জুড়ে আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত অগ্নিকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিগত লোভ আজ জগৎব্যাপী বেদীতে নরমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত। একে যদি ঠেকাতে না পারি তবে মানব-ইতিহাসে মহাবিনাশের সৃষ্টি হবেই হবে। শক্তিশালীরা একত্রে মিলে এর প্রতিরোধ কখনোই করতে পারবে না, অশক্তেরা মিললে তবেই এর প্রতিকার হবে। কারণ, বৈষয়িক ব্যাপারে জগতে শক্ত-অশক্তের যে ভেদ সেইটেই আজ বড়ো সাংঘাতিক। জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ আছে, কিন্তু জ্ঞানের অধিকার নিয়ে মানুষ প্রাচীর তোলে না, বুদ্ধি ও প্রতিভা দলবাঁধা শক্তিকে বরণ করে না। কিন্তু ব্যক্তিগত অপরিমিত ধনলাভ নিয়ে দেশে দেশে ঘরে ঘরে

যেসব ভেদের প্রাচীর উঠছে তাকে স্বীকার করতে গেলে মানুষকে পদে পদে কপাল ঠুকতে, মাথা হেঁট করতে হবে। পূর্বে এই পার্থক্য ছিল, কিন্তু এর প্রাচীর এত অভ্রভেদী ছিল না। সাধারণত লাভের পরিমাণ ও তার আয়োজন এখনকার চেয়ে অনেক পরিমিত ছিল; সুতরাং মানুষের সামাজিকতা তার ছায়ায় আজকের মতো এমন অন্ধকারে পড়ে নি, লাভের লোভ সাহিত্য কলাবিদ্যা রাষ্ট্রনীতি গার্হস্থ্য সমস্তকেই এমন করে আচ্ছন্ন ও কলুষিত করে নি। অর্থচেষ্টার বাহিরে মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্র আরো অনেক প্রশস্ত ছিল।

তাই আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। বিরাট্‌কায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখশান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই 'পরে। অর্থোপার্জনের কঠিন-বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশপথ নির্মাণ তাদেরই হাতে। নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই বল-লাভ ক'রে তার প্রতিকার করতে হবে।

আজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে য়ুরোপে সমবায়নীতি অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেখানে সুবিধা এই যে, মানুষে মানুষে একত্র হবার বুদ্ধি ও অভ্যাস সেখানে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা, অন্তত হিন্দুসমাজের লোকে, এই দিকে দুর্বল। কিন্তু এটা আশা করা যায় যে, যে মিলনের মূলে অন্নবস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা সে মিলনের পথ দুঃসহ দৈন্যদুঃখের তাড়নায় এই দেশেও ক্রমশ সহজ হতে পারে। নিতান্ত যদি না পারে তবে দারিদ্র্যের হাত থেকে কিছুতেই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। না যদি পারে তা হলে কাউকে দোষ দেওয়া চলবে না।

এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, এক কালে আমাদের জীবনযাত্রা যেরকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণ ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তা

হলে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধঃপাত হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিত্রাণ বলে না।

এক কালে যা নিয়ে মানুষ কাজ চালিয়েছে চিরদিন তাই নিয়ে চলবে, মানুষের ইতিহাসে এমন কথা লেখে না। মানুষের বুদ্ধি যুগে যুগে নূতন উদ্‌ভাবনার দ্বারা নিজেকে যদি প্রকাশ না করে তবে তাকে সরে পড়তে হবে। নূতন কাল মানুষের কাছে নূতন অর্ঘ্য দাবি করে; যারা জোগান বন্ধ করে তারা বরখাস্ত হয়। মানুষ আপনার এই উদ্‌ভাবনী শক্তির জোরে নূতন নূতন সুযোগ সৃষ্টি করে। তাতেই পূর্বযুগের চেয়ে তার উপকরণ আপনিই বেড়ে যায়। যখন হাল-লাঙল ছিল না তখনো বনের ফলমূল খেয়ে মানুষের এক রকম করে চলে যেত; এ দিকে তার কোনো অভাব আছে এ কথা কেউ মনেও করত না। অবশেষে হাল-লাঙলের উৎপত্তি হবা মাত্র সেইসঙ্গে জমিজমা চাষ-আবাদ গোলাগঞ্জ আইনকানুন আপনি সৃষ্টি হতে থাকল। এর সঙ্গে উপদ্রব জমেছে অনেক— অনেক মার-কাট, অনেক চুরি-ডাকাতি, জাল-জালিয়াতি, মিথ্যাচার। এসমস্ত কী করে ঠেকানো যায় সে কথা সেই মানুষকেই ভাবতে হবে যে মানুষ হাল-লাঙল তৈরি করেছে। কিন্তু গোলমাল দেখে যদি হাল-লাঙলটাকেই বাদ দিতে পরামর্শ দাও তবে মানুষের কাঁধের উপর মুণ্ডটাকে উল্টো ক'রে বসাতে হয়। ইতিহাসে দেখা গেছে, কোনো কোনো জাতের মানুষ নূতন সৃষ্টির পথে এগিয়ে না গিয়ে পুরানো সঞ্চয়ের দিকেই উল্টো মুখ করে স্থাণু হ'য়ে বসে আছে; তারা মৃতর চেয়ে খারাপ, তারা জীবন্মৃত। এ কথা সত্য, মৃতর খরচ নাই। কিন্তু তাই বলে কে বলবে মৃত্যুই দারিদ্র্যসমস্যার ভালো সমাধান? অতীত কালের সামান্য সম্বল নিয়ে বর্তমান কালে কোনোমতে বেঁচে থাকা মানুষের নয়। মানুষের প্রয়োজন অনেক,

আয়োজন বিস্তর, সে আয়োজন জোগাবার শক্তিও তার বহুধা। বিলাস বলব কাকে ? ভেরেণ্ডার তেলের প্রদীপ ছেড়ে কেরোসিনের লণ্ঠনকে, কেরোসিনের লণ্ঠন ছেড়ে বিজলি-বাতি ব্যবহার করাকে বলব বিলাস ? কখনোই নয়। দিনের আলো শেষ হলেই কৃত্রিম উপায়ে আলো জ্বালাকেই যদি অনাবশ্যক বোধ কর, তা হলেই বিজলি-বাতিকে বর্জন করব। কিন্তু যে প্রয়োজনে ভেরেণ্ডা তেলের প্রদীপ একদিন সন্ধ্যাবেলায় জ্বালতে হয়েছে সেই প্রয়োজনেরই উৎকর্ষসাধনের জন্য বিজলি-বাতি। আজ একে যদি ব্যবহার করি তবে সেটা বিলাস নয়, যদি না করি সেটাই দারিদ্র্য। একদিন পায়ে-হাঁটা মানুষ যখন গোরুর গাড়ি সৃষ্টি করলে তখন সেই গাড়িতে তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই গোরুর গাড়ির মধ্যেই আজকের দিনের মোটরগাড়ির তপস্যা প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মানুষ সেদিন গোরুর গাড়িতে চড়েছিল সে যদি আজ মোটরগাড়িতে না চড়ে তবে তাতে তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। যা এক কালের সম্পদ তাই আর-এক কালের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়ার দ্বারা দারিদ্র্যের নিবৃত্তি শক্তিহীন কাপুরুষের কথা।

এ কথা সত্য, আধুনিক কালে মানুষের যা-কিছু সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশই ধনীর ভাগ্যে পড়ে। অর্থাৎ অল্পলোকেরই ভোগে আসে, অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হয়। এর দুঃখ সমস্ত সমাজের। এর থেকে বিস্তর রোগ তাপ অপরাধের সৃষ্টি হয়, সমস্ত সমাজকেই প্রতি ক্ষণে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। ধনকে খর্ব ক'রে এর নিষ্পত্তি নয়, ধনকে বলপূর্বক হরণ ক'রেও নয়, ধনকে বদান্যতা যোগে দান ক'রেও নয়। এর উপায় ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি যথাসম্ভব সকলের মধ্যে জাগরূক করা, অর্থাৎ সমবায়নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের

অসাম্য কোনোদিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। কেননা, শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত। এই শক্তির অসাম্যের বাহ্যপ্রকাশ নানা আকারে হতেই হবে। তা ছাড়া স্বভাবের বৈচিত্র্যও আছে, কেউ-বা টাকা জমাতে ভালোবাসে, কারো-বা জমাবার প্রবৃত্তি নেই, এমনি করে ধনের বন্ধুরতা ঘটে। মানবজীবনের কোনো বিভাগেই একটানা সমতলতা একাকারতা সম্ভবও নয় শোভনও নয়। তাতে কল্যাণও নেই। কারণ, প্রাকৃতিক জগতেও যেমন মানবজগতেও তেমনি, সম্পূর্ণ সাম্য উদ্যমকে স্তব্ধ করে দেয়, বুদ্ধিকে অলস করে। অপর পক্ষে অতিবন্ধুরতাও দোষের। কেননা, তাতে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে তার দ্বারা মানুষে মানুষে সামাজিকতার যোগ অতিমাত্রায় বাধা পায়। যেখানেই তেমন বাধা সেই গহ্বরেই অকল্যাণ নানা মূর্তি ধ'রে বাসা বাঁধে। পূর্বেই বলেছি, আজকের দিনে এই অসাম্য অপরিমিত হয়েছে, তাই অশান্তিও সমাজনাশের জন্য চার দিকে বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত।

বর্তমান কাল বর্তমান কালের মানুষের জন্যে বিদ্যা স্বাস্থ্য ও জীবিকা নির্বাহের জন্যে যেসকল সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষেই দুর্লভ না হয় সর্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই। কোনোমতে খেয়ে-প'রে টিকে থাকতে পারে এতটুকু মাত্র ব্যবস্থা কোনো মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত অর্থ, উদ্বৃত্ত অবকাশ মনুষ্যত্বচর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।

আজ সভ্যতার গৌরবরক্ষার ভার অল্প লোকেরই হাতে; কিন্তু এই অত্যল্প লোকের পোষণ-ভার বহুসংখ্যক লোকের অনিচ্ছুক শ্রমের উপর। তাতে বিপুলসংখ্যক মানুষকে জ্ঞানে ভোগে স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হয়ে মূঢ় বিকলচিত্ত হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এত অপরিমিত মূঢ়তা ক্লেশ অস্বাস্থ্য আত্মাবমাননার বোঝা লোকালয়ের উপর চেপে রয়েছে;

অভ্যাস হয়ে গেছে ব'লে, একে অপরিহার্য জেনেছি ব'লে, এর প্রকাণ্ড-পরিমাণ অনিষ্টকে আমরা চিন্তার বিষয় করি নে। কিন্তু আর উদাসীন থাকবার সময় নেই। আজ পৃথিবী জুড়ে চার দিকেই সামাজিক ভূমিকম্প মাথা-নাড়া দিয়ে উঠেছে। সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ পুঞ্জীভূত শক্তির অতিভারেই এমনতরো দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। আজ শক্তিকে মুক্তি দিতে হবে।

আমাদের এই গ্রামপ্রতিষ্ঠিত কৃষিপ্রধান দেশে একদিন সমবায়নীতি অনেকটা পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন মানুষের জীবনযাত্রা ছিল বিরলাঙ্গিক। প্রয়োজন অল্প থাকাতে পরস্পরের যোগ ছিল সহজ। তখনো স্বভাবতই ধনীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল ; কিন্তু এখন ধনীরা আত্মসম্ভোগের দ্বারা যেমন বাধা রচনা করেছে তখন ধনীরা তেমনি আত্মত্যাগের দ্বারা যোগ রচনা করেছিল। আজ আমাদের দেশে ব্যয়ের বৃদ্ধি ও আয়ের সংকীর্ণতা বেড়ে গেছে বলেই ধনীর ত্যাগ দুঃসাধ্য হয়েছে। সে ভালোই হয়েছে ; এখন সর্বসাধারণকে নিজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে উদ্‌ভাবিত করতে হবে, তাতেই তার স্থায়ী মঙ্গল। এই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতসভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত, পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ আজও দিকে দিকে স্বল্পধনের পথরোধ করে দাঁড়ায় নি। এইজন্যই সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্বজনের চেষ্টার পবিত্র সম্মিলনতীর্থে অন্নপূর্ণার আসন ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

১৩৩৫

পরিশিষ্ট

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু, মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয়, আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে, জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য ; মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি নে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোনো-একটা বাহ্য কর্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয় ; এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজি ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সে-রকম পথ নয়। বুঝেছিলুম, এই পথ দিয়ে কোনো-একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যাঁর মধ্যে অন্নের সকল-প্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লণ্ডের কবি ও কর্মবীর A. E. -রচিত *National Being* বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়, অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি— এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এসব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বৈকি। কোনো বড়ো সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিসের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায় এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশ্বাসও করছেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যাঁরা তর্কে নামেন তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা পরিমাণ খদ্দর হতে পারে। অর্থাৎ তাঁদের হিসাব-মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তা হলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু দৈন্য জিনিসটা জটিল মিশ্র জিনিস। আর, এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে

ও চরিত্রের দুর্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধরে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না? দেশসুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু-ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারি থূৎকারপ্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না।…

আয়র্লণ্ডে সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়-জীবিকা-প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম শুরু হয়েছে *National Being* বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে দেশের যে কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লণ্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তিনি একই কালে ভারতবর্ষের জন্যেও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন তা হলে

তিনি তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ করে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের শামিল করে দেখে ; তারা জানে না যে, অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

ভাদ্র ১৩৩২

সমবায়নীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও বক্তৃতা দিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত হইল। নিম্নে সাময়িক পত্রে রচনাগুলির প্রকাশের সূচী[১] মুদ্রিত হইল—

সমবায় (১) ভাণ্ডার শ্রাবণ ১৩২৫

সমবায় (২) বঙ্গবাণী ফাল্গুন ১৩২৯

ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা ভাণ্ডার শ্রাবণ ১৩৩৪

পরিশিষ্ট : 'চরকা' প্রবন্ধের অংশ সবুজপত্র ভাদ্র ১৩৩২

সমবায়নীতি প্রবন্ধ মূলতঃই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (২৭ মাঘ ১৩৩৫)।

ভূমিকারূপে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের বাণী শ্রীসুধীরচন্দ্র কর লিখিত 'লোকসেবক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৬০) অংশতঃ প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষের কর্মীদের প্রতি আশীর্বাণীরূপে ইহা প্রেরিত হইয়াছিল (১৯২৮); অন্যতম কর্মী শ্রীনন্দলাল চন্দ্রের সৌজন্যে এই তথ্য এবং এই রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

এই তালিকায় উল্লিখিত 'ভাণ্ডার' বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতির মুখপত্র— সমবায়(১) প্রবন্ধ ইহার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমবায়(২) নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থের ভূমিকারূপে কল্পিত— তাঁহার 'জাতীয় ভিত্তি' (১৩৩৮) গ্রন্থে ভূমিকারূপে ইহা মুদ্রিত হয়। 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধের অতিরিক্ত এক অনুচ্ছেদ ঐ ভূমিকায় (ও বর্তমান গ্রন্থে) মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ('চরকা' প্রবন্ধে)

---

১ গ্রন্থমধ্যে রচনা-শেষে এই সকল তারিখ ব্যবহৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন 'আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন', নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম।

১৯২৭ সালের '২রা জুলাই আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসবের দিনে কলিকাতায় [অ্যালবার্ট হলে] বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত উৎসবের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন', শ্রীহিরণকুমার সান্যাল ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের লিখিত তাহার অনুলিপি বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ভাণ্ডার পত্রে 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' নামে মুদ্রিত হয়।

শ্রীনিকেতনে ১৩৩৫ সালের ২৭ মাঘ সর্ ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের সভাপতিত্বে বর্ধমান বিভাগীয় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়— রবীন্দ্রনাথ তাহার উদ্‌বোধনকালে যে প্রবন্ধ রচনা করেন তাহা ঐ উপলক্ষ্যে 'সমবায়নীতি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (২৭ মাঘ ১৩৩৫)।

'জনসাধারণের নিজের অর্জনশক্তিকে মেলাবার উদ্যোগ', 'অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার উপায়', যাহাতে মানুষ 'মিলিয়া বড়ো হইবে', 'শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় বড়ো হইবে'— সমবায়ের এই মূলতত্ত্ব দেশের উন্নতির পন্থারূপে রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক রচনায় আলোচিত হইয়াছে— নিজের জমিদারিতে ও পরে বিশ্বভারতীতে তাহা কার্যতঃও প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 'রবীন্দ্রজীবনী'তে তাহার বিবরণ আছে— "রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে· ·সমবায়শক্তি জাগরূক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন তখন বাংলাদেশে সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই"। সমবায়-সমিতি-রূপে পরিকল্পিত 'হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার সময়েও তিনি উহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই পুস্তকে সমবায়নীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিত রচনাদিই মুদ্রিত হইল। পরিশিষ্ট ব্যতীত অন্য রচনাগুলি পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই, এই পুস্তকে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত হইল।

বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা, ও বিশ্বভারতীর চিরসুহৃৎ পরলোকগত সুধীরকুমার লাহিড়ী এই সংকলন-কার্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহারই উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ সমবায়নীতি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশকালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ তাঁহাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালান্তর

১৩২১ সাল হইতে জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত নানা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এই গ্রন্থে তাহা সংকলিত হইয়াছে। রচনাসূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

বৃহত্তর ভারত
হিন্দুমুসলমান
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
হিন্দুমুসলমান
রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত
নারী
কন্‌গ্রেস
আরোগ্য
সভ্যতার সংকট

স্বদেশ

১২৯৮-১৩১২ সালে লিখিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে—

নূতন ও পুরাতন
নববর্ষ
ভারতবর্ষের ইতিহাস
দেশীয় রাজ্য
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা
ব্রাহ্মণ
সমাজভেদ
ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত

শিক্ষা

শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর সংকলন।

শিক্ষার হেরফের
ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ
শিক্ষা-সংস্কার
শিক্ষাসমস্যা
জাতীয় বিদ্যালয়
আবরণ
তপোবন
ধর্মশিক্ষা
শিক্ষাবিধি
লক্ষ্য ও শিক্ষা
স্ত্রীশিক্ষা
শিক্ষার বাহন
ছাত্রশাসনতন্ত্র
অসন্তোষের কারণ
বিদ্যার যাচাই
বিদ্যাসমবায়
শিক্ষার মিলন
বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ
শিক্ষার বিকিরণ
শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষার ব্যাবহারিক দিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় রচনা ও আলোচনা অপর একটি খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের অধিককাল শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন এই গ্রন্থে তাহার অধিকাংশ সংকলিত হইয়াছে।

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

এই গ্রন্থে শান্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী।